আনন্দবাজার পত্রিকা রবিবাসরীয়

‘রাজনৈতিক আগ্রহই আমাকে অর্থনীতিতে নিয়ে এসেছিল’

‘তার আগে ভেবেছিলাম, পদার্থবিদ্যা পড়ব। প্রেসিডেন্সি কলেজের সিঁড়িতে সে দিন আমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল বন্ধু সুখময় চক্রবর্তী। ও-ই আমাকে প্রথম নিয়ে এল কফি হাউসে। ১৯৫২-৫৩ সালে কলেজ ইউনিয়নে বামপন্থী প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হওয়ার পিছনে আমারও ভূমিকা ছিল।’

অমর্ত্য সেন

১৮ অগস্ট, ২০১৯

তারুণ্য: অমর্ত্য সেন। ছবি শান্তিনিকেতনে ‘প্রতীচী’ বাড়ির সৌজন্যে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে পারাটা খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার। এখানেই আমি শিক্ষক জীবন শুরু করি। সুতরাং, এখানে আসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা। সেই সঙ্গে এই আলোচনাটির সভাপতিত্ব করার জন্য পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও আমি খুবই কৃতজ্ঞ।

১৯৫১-র জুলাই মাসের এক বৃষ্টিভেজা দিনে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে এসে ভর্তি হই; পড়বার বিষয় অর্থনীতি, সঙ্গে গণিত। আমার স্কুলের পড়াশোনা শান্তিনিকেতনে। ভেবেছিলাম সেখানকার স্কুলের পড়া শেষ করে কলকাতায় এসে পদার্থবিদ্যা ও গণিত পড়ব। আমার মত-বদলের পিছনে একটা কারণ ছিল আমার রাজনৈতিক আগ্রহ ও সে বিষয়ে চিন্তা; আমার মনে হয়েছিল, অর্থনীতির অধ্যয়ন এ ব্যাপারে বেশি করে কাজে লাগবে। ইতিমধ্যেই আমি এক ভিন্নতর ভারতের ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলাম। নাছোড় সেই ধারণায় আমার ভারতবর্ষ ছিল দারিদ্র, বৈষম্য ও অন্যায় থেকে মুক্ত। সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়ে চিন্তা করার জন্য অর্থনীতি বিষয়ে কিছুটা ধারণা যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এই ভাবনাটা আমার পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

আমার অর্থনীতি পড়ার সিদ্ধান্তটার পিছনে অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্তের সঙ্গে আলোচনারও প্রভাব ছিল। অধ্যাপক দাশগুপ্ত ছিলেন খুব বড় মাপের অর্থশাস্ত্রী। তিনি আমাদের ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধুও ছিলেন— ওঁকে আমি কাকা ডাকতাম। অর্থনীতি পড়ার সিদ্ধান্তটা আরও পাকা হয় সুখময় চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের পথ ধরে। আমি যখন শান্তিনিকেতনে ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স (আইএসসি) পড়ছি, সুখময় তখনই প্রেসিডেন্সিতে, ও পড়ছিল ইন্টারমিডিয়েট আর্টস (আইএ)। সুখময়কে মেধাবী বললে তার সম্পর্কে অত্যন্ত কম বলা হয়। অবিশ্বাস্য ক্ষুরধার বুদ্ধি ও সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী ক্ষমতা তো তার ছিলই, সেই সঙ্গে সে ছিল প্রায় সব বিষয়েই ওয়াকিবহাল, তাই সব মিলিয়ে অনন্য। আমার মতোই সুখময়ও ছিল রাজনৈতিক দিক দিয়ে বামপন্থা ঘেঁষা। ও আমাকে বলেছিল, ওর অর্থনীতিকে বিষয় হিসেবে বেছে নেওয়ার কারণ ছিল গভীর রাজনৈতিক আগ্রহ এবং বিশেষ করে মার্ক্সীয় চিন্তার প্রতি জোরদার টান। সুখময়

বলত, আমাদের চারপাশের দুনিয়াটাকে একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে তার সঙ্গে আমার দ্বিমত পোষণের কোনও কারণ ছিল না। সুখময় প্রায়ই শান্তিনিকেতনে আসত। ওর সঙ্গে কথাবার্তার সুবাদে আমার অর্থনীতি ও গণিত পড়বার ইচ্ছাটা ধীরে ধীরে, কিন্তু প্রবল ভাবেই, পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে।

প্রেসিডেন্সিতে পৌঁছেই কলেজের মূল সিঁড়িটাতে সুখময়কে দেখতে পাই। এই সিঁড়িটা দিয়েই আমরা দোতলায় ক্লাসে যেতাম। এটা ছিল প্রেসিডেন্সির একটা বিশেষ সম্পদ। যে-সব ঐতিহাসিক কারণে এই সিঁড়ি বিখ্যাত হয়ে আছে তার মধ্যে একটা হল, এখানে দাঁড়িয়েই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর ছাত্রাবস্থায় কলেজের ইংরেজ প্রিন্সিপালকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কত খারাপ সে বিষয়ে বেশ কড়া একটা বক্তৃতা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। শোনা যায়, প্রিন্সিপালকে হেনস্থা করার কাজেও তিনি জড়িয়ে পড়েন, যদিও এ-বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তো, সেই প্রথম দিনেই সুখময় আমাকে দেখে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল এবং আমাকে চারপাশটা ঘুরিয়ে দেখাল। প্রেসিডেন্সিতে আসা, এখানে অর্থনীতি পড়া, এবং অবশ্যই সুখময়ের সান্নিধ্য, সব মিলিয়ে আমি চট করে ওখানে বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করেছিলাম।

সুখময় আমাকে কফি হাউসে ধরে নিয়ে গেল। তখন কফি হাউস ছিল শ্রমিকদের এক সমবায়— ওয়ার্কার্স কো-অপারেটিভ। পরে এটি ইন্ডিয়ান কফি বোর্ডের অধীনে যায়, কিন্তু, আমি যত দূর জানি, এখন আবার সমবায় হিসেবেই চলছে। কফি হাউস ছিল এক চমৎকার জায়গা। সেখানে আড্ডা মারার আনন্দ পাওয়া থেকে শুরু করে গুরুগম্ভীর বিষয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে নানা জিনিস শিখতে পারার সুযোগটা সত্যিই একটা খুব বড় ব্যাপার ছিল। আমার মনে আছে, রাজনীতি নিয়ে যে-সব হাজার রকমের তর্ক হত, তার কিছু কিছু আমাদের বক্তব্যের যুক্তি সরবরাহ করত। এই আড্ডাগুলো থেকে আমি যে কী পরিমাণ উপকৃত হয়েছি তা বোঝানো সহজ নয়। এর বেশির ভাগটাই আমি পেয়েছি সহপাঠীদের কাছ থেকে। তাদের কাছ থেকে আমি জানতাম তারা কী ভাবছে, কিংবা কে নতুন কী পড়ল, বা অন্য কোথাও থেকে কিছু

জানতে পারল। বিভিন্ন ক্লাসে পড়ানো ইতিহাস থেকে অর্থনীতি, নৃবিজ্ঞান থেকে জীববিজ্ঞান বা পদার্থবিদ্যা পর্যন্ত নানা বিষয় ছিল সেই জানার অঙ্গ।

২

বিভিন্ন বিষয়ে টুকরোটাকরা জ্ঞানের সরাসরি আদানপ্রদানের চেয়েও বড় ব্যাপার ছিল নানা বিষয়ে অত্যন্ত সুসংবদ্ধ তর্ক। ক্ষুরধার যুক্তির সাহায্যে সেই তর্কগুলোতে একে অন্যের মত ও বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হত। আমার চেয়ে কয়েক বছর আগে প্রেসিডেন্সিতে পড়া, অনন্য ইতিহাসবিদ তপন রায়চৌধুরী কফি হাউসের এই আড্ডা সম্পর্কে যা লিখেছিলেন, কিছুটা অত্যুক্তি থাকলেও তা মোটের ওপর খুব একটা ভুল নয়: 'আমাদের মধ্যে অনেকেই যা শিখেছি এই 'জ্ঞানপীঠ'-এ [কফি হাউসে], আমাদের সহপাঠীদের কাছ থেকে, রাস্তার ওপারে কলেজে গিয়ে ক্লাসে বসার আর প্রয়োজনই হত না।' (দ্য ওয়ার্ল্ড ইন আওয়ার টাইম, নয়ডা ও লন্ডন, হার্পার কলিন্স, ২০১১, পৃ. ১৫৪)

কেবল প্রেসিডেন্সি থেকেই নয়, কফি হাউসের আড্ডায় যোগ দিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং আশপাশের বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। কলেজ স্ট্রিটের অনেকটা জুড়ে ছিল, প্রেসিডেন্সির পাশেই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এই এলাকায় ছিল মেডিক্যাল কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ (যার পূর্বতন নাম ছিল ইসলামিয়া কলেজ, এবং পরে নাম বদলে হয় মৌলানা আজাদ কলেজ) এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। প্রেসিডেন্সি ও কফি হাউসের মাঝখানে কলেজ স্ট্রিট।

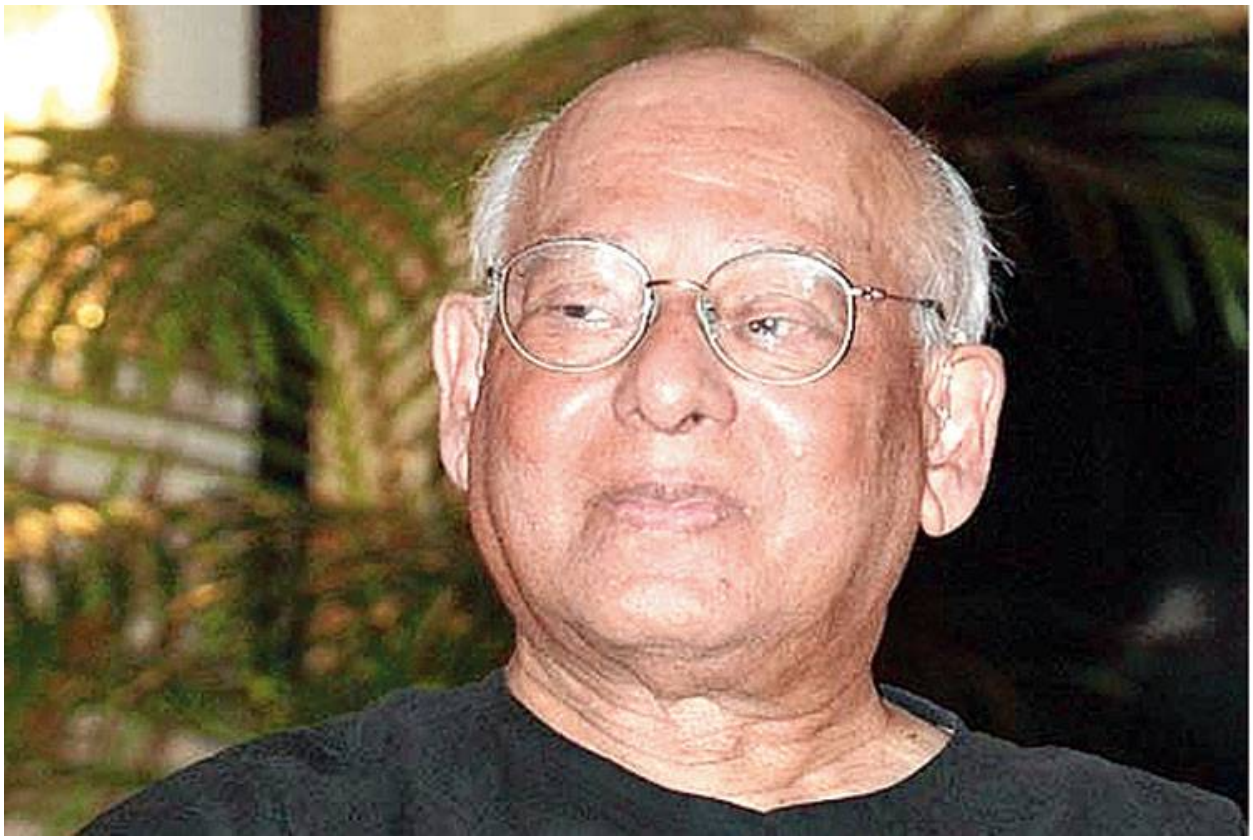

তাত্ত্বিক: রণজিৎ গুহ

কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসের দিকটাকে কলেজ স্কোয়ারও বলা হত। সেখানকার সারি সারি বইয়ের দোকানগুলো ছিল একই সঙ্গে আনন্দ ও পড়াশোনার আর একটা জায়গা। আমার প্রিয় বইয়ের দোকান ছিল দাশগুপ্ত। এটা আমার কাছে ছিল খানিকটা লাইব্রেরির মতো। সেখানে দাঁড়িয়ে বা টুলের ওপর বসে দোকানের তাক থেকে যে কোনও বই তুলে নিয়ে পড়ার ব্যাপারে মালিক দাশগুপ্তবাবু আমাদের খুবই প্রশ্রয় দিতেন। কখনও কখনও তিনি সুখময় ও আমাকে এক রাতের জন্য বই ধারও দিয়ে দিতেন, তবে শর্ত ছিল, বইতে যেন কোনও দাগ না লাগে। বই দেওয়ার আগে তিনি অনেক সময় খবরের কাগজের মলাট দিয়ে দিতেন। তিনি ভালই জানতেন যে, আমরা বই বড় একটা কিনব না, কেবল পড়ব। এক বার এক বন্ধু আমার সঙ্গে সেই দোকানে গিয়েছিল। সে দাশগুপ্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, “আচ্ছা, অমর্ত্য তো বই কিনতে পারে না, তাতে আপনি ওকে কিছু বলেন না?” দাশগুপ্তবাবু উত্তর দিয়েছিলেন,

“যদি শুধু পয়সাই রোজগার করতে চাইব, তা হলে গয়নার দোকান না দিয়ে আমি বইয়ের দোকান করলাম কেন?”

৩

প্রেসিডেন্সির ছাত্রদের মধ্যে বেশির ভাগই রাজনৈতিক ভাবে খুব সক্রিয় ছিল। সেটা ছিল প্রধানত বামপন্থী রাজনীতির গোড়ার দিকের উত্থানের পর্ব। কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ নিজের মধ্যে জাগাতে পারিনি বটে, কিন্তু বামপন্থীদের মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও তাঁদের সমতার প্রতি দায়বদ্ধতা আমাকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল। প্রেসিডেন্সি যদিও প্রধানত উচ্চবর্গীয়দের কলেজ, কিন্তু আমার অনেক বন্ধু ও সহপাঠীর মধ্যেও বামপন্থার আবেদন বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। শান্তিনিকেতনে স্কুলে পড়ার সময় থেকেই আমার মধ্যে কিছু আকাঁড়া চিন্তাভাবনা গড়ে ওঠে, যেগুলোর তাগিদে আমি আশপাশের সাঁওতাল গ্রামগুলোতে নিরক্ষর ছেলেমেয়েদের জন্য নিয়মিত নাইট ইস্কুল চালাতাম। প্রেসিডেন্সিতে এসে সেই আকাঁড়া চিন্তাভাবনাগুলোকে সুব্যবস্থিত ভাবে সামাজিক দিক দিয়ে প্রসারিত করে তোলার এবং রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনটা খুব বেশি করে অনুভব করলাম।

রাজনীতিতে আগ্রহী যে-সব সহপাঠীর সঙ্গে আমি মেলামেশা করতাম তাদের অনেকেই, আমার মতোই, স্টুডেন্টস ফেডারেশনের মধ্য দিয়ে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল, কিন্তু অধিকাংশই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়নি। কিছু বাঁধাধরা ধারণার নিগড়ে বাঁধা দলীয় শৃঙ্খলার ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ অস্বস্তিকর ছিল। তা সত্ত্বেও— সেই সময়ে— বামপন্থার মধ্যে সাম্য ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি এমন এক দায়বদ্ধতা ছিল, অন্য কোনও ছাত্রগোষ্ঠী যার কাছাকাছিও আসতে পারত না। মননচর্চা ও সংস্কৃতির দিক থেকে কলকাতার বিপুল সমৃদ্ধি সত্ত্বেও তার চার পাশে অবিচ্ছিন্ন ও অসহনীয় দারিদ্র উপেক্ষা করা প্রেসিডেন্সির মতো উচ্চবর্গীয় কলেজের পক্ষেও সম্ভব ছিল না।

স্বাভাবিক ভাবেই আমি বামপন্থীদের ছাত্র শাখাটির দিকে ঝুঁকেছিলাম, কিন্তু একই সঙ্গে এর নিষ্প্রশ্ন গোঁড়ামি এবং কট্টরপন্থী বামেদের কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ না দেখিয়েই সংসদীয় গণতন্ত্রকে 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র' বলে গাল পাড়ার ব্যাপারটা মন থেকে মেনে নিতে পারিনি। অবশ্য বামপন্থার এই মিশ্র চরিত্র আমাদের অনেকের কাছেই স্টুডেন্টস ফেডারেশনে যোগ দেওয়ার এবং তাতে বিশেষ ভূমিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ১৯৫২-৫৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে বামপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা বেশ কয়েকটি পদে প্রতিষ্ঠিত হন; এটা বলা ভুল হবে না যে, এই নির্বাচনে আমার কিছু নেতৃস্থানীয় ভূমিকা ছিল।

৪

১৯৫৩ সালে আমি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাই। ১৯৫৫'তে স্নাতক হওয়ার পর ওখানেই পিএইচ ডি করার জন্য নাম লেখাই। নেহাত বরাতজোরে— কোনও বিশেষ প্রতিভার গুণে নয়— আমি খুব দ্রুত কিছু গবেষণার ফলাফল পেয়ে যাই, যেগুলো নিয়ে লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ অর্থনীতি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য চট করে গৃহীত হয়। আমার শিক্ষক মরিস ডব দেখে বললেন, এই লেখাগুলো একত্র করে একটি পিএইচ ডি থিসিস হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ, পিএইচ ডি'র জন্য নাম লেখানোর প্রথম বছরের শেষেই কার্যত আমার থিসিস লেখা হয়ে যায়। কিন্তু সমস্যা হল, কেমব্রিজের নিয়ম অনুযায়ী তিন বছরের আগে আমি থিসিস জমা দিতে পারব না। মানে থিসিস জমা দেওয়ার জন্য আমাকে দু'বছর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। বেশ হতাশাজনক অবস্থা। তার ওপর কলকাতা ও তার মননচর্চার জগতের জন্য মনটা ছটফট করছিল। আমার জীবনে যাদবপুরের আগমন এই জটিল পরিস্থিতির ফল— আমার পক্ষে বেশ চমৎকার ফলই বলতে হবে।

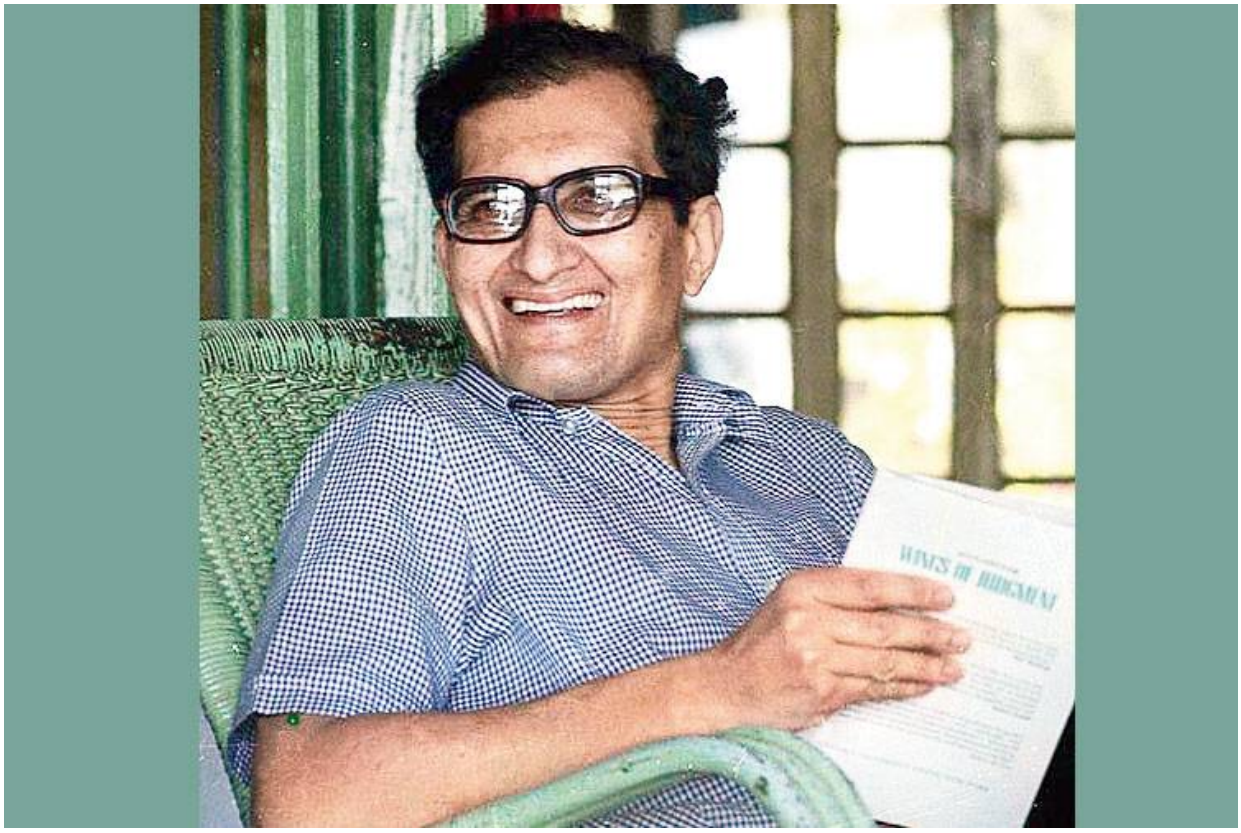

প্রথম ধাপটা ছিল কেমব্রিজ ছেড়ে কলকাতা পৌঁছনো। কেমব্রিজ কর্তৃপক্ষের কাছে আমি দু'বছরের জন্য ভারতে ফিরে যাওয়ার একটা প্রস্তাব পেশ করলাম। আমি তাঁদের বললাম, দেশে ফিরে আমি আমার গবেষণায় পাওয়া তত্ত্বগত ফলাফলগুলো ভারতের তথ্যের সঙ্গে খুব যত্ন করে মিলিয়ে দেখব (আমার থিসিসটাকে বয়স বাড়ানোর জন্য কেমব্রিজে রেখে এলাম, মদের গুণ বাড়াতে যেমন তাকে পুরনো হতে রেখে দেওয়া হয়!)। যাদবপুর তখনও একটি বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, তবে সেই সময় এটিকে পুরোদস্তুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার কাজ চলছিল। হঠাৎ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্যের কাছ থেকে আমি একটা চাকরির প্রস্তাব-সহ চিঠি পাই। চিঠি পেয়ে আমি কিছুটা বিস্মিত এবং তার চেয়ে বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ি। তাঁরা আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগটি গড়ে তোলার দায়িত্ব দিতে চান। চ্যালেঞ্জটাতে ভয় পাওয়ার কারণ ছিল— তখন আমার বয়েস তেইশ বছর, প্রফেসর বা বিভাগীয় প্রধান হওয়ার কথা একেবারেই ভাবিনি। কিন্তু আমি তো অনেক দিন ধরে অর্থনীতির পাঠ্যসূচি কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে কলকাতা ও কেমব্রিজের লোকেদের

বক্তৃতা শুনিয়ে জ্বালিয়ে মেরেছি, এখন যখন সত্যিই কাজটা করার পালা এসেছে, আমার কাছে পালিয়ে বাঁচার কোনও ভদ্রস্থ কারণ রইল না।

যা-ই হোক, প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে উঠে অগস্ট মাসের এক বৃষ্টিভেজা দিনে যাদবপুরে যোগ দিলাম এবং অর্থনীতির ছাত্রছাত্রীদের জন্য সিলেবাস তৈরির কাজে লেগে পড়লাম। সেই সঙ্গে শুরু হল আমার সহকর্মী জোগাড় করার কাজ। অর্থনীতি বিভাগটা গড়ে ওঠার সময়ে শিক্ষক কম থাকার কারণে আমাকে প্রচুর ক্লাস নিতে হত। যখন শিক্ষক নিয়োগের কাজটা চলছিল, আমার মনে আছে, আমাকে অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়ে সপ্তাহে আটাশটা পর্যন্ত লেকচার দিতে হয়েছে। এতে খুবই ধকল যেত, কিন্তু একই সঙ্গে এর মধ্যে ছিল বড় একটা চ্যালেঞ্জ, আর কিছু মজাও। ছাত্রদের পড়াবার জন্য প্রস্তুতির প্রচেষ্টায় অর্থনীতির বিভিন্ন ব্যাপারে অনেক কিছু জানা হয়ে যেত। আমার পক্ষে পড়ানোর অভিজ্ঞতাটা ছিল খুবই শিক্ষাপ্রদ, এবং আমার আশা, ছাত্ররাও সেগুলো থেকে কিছু না কিছু পেত। এই অভিজ্ঞতার সূত্রে আমি নির্ধারণ করলাম, কোনও বিষয় যতক্ষণ না পড়াচ্ছি, ততক্ষণ সেই বিষয়টা ভাল ভাবে আয়ত্ত করেছি এ রকম মনে করাটা উচিত নয়।

অধ্যাপনার মতো কাজের বিচারে আমার বয়সটা তখন নিতান্ত কম। তার ওপর আবার অনেক আলোচনা চলছিল যে, নিজের যোগ্যতায় নয়, আমি চাকরিটা পেয়েছি খুঁটির জোরে। স্বাভাবিক কারণেই এ নিয়ে বেশ জল ঘোলা হল। অনেকে আবার এর মধ্যে রাজনীতির গন্ধ পেয়ে গেলেন— মাত্র তিন বছর আগেই তো প্রেসিডেন্সি কলেজে বামপন্থী ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে আমার সক্রিয় সংযোগ ছিল— বামপন্থী রাজনীতির প্রতি আমার দায়বদ্ধতা এই সন্দেহকে গাঢ় করে তুলল। এর মধ্যে সব থেকে তীক্ষ্ণ আক্রমণটা এসেছিল ‘যুগবাণী’ নামক একটি পত্রিকা থেকে। অত্যন্ত দক্ষিণপন্থী এই কাগজটাতে প্রায় এমন একটা আশঙ্কা প্রকাশিত হল, যেন যাদবপুরে আমার চাকরি পাওয়ার মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে প্রলয় ঘনিয়ে আসছে! এই সব খবর আমার পক্ষে খুব সুখপাঠ্য ছিল না ঠিকই, কিন্তু পত্রিকায় ছাপা একটা কার্টুন দেখে বেশ মজা

পেয়েছিলাম, তাতে দেখানো হয়েছিল আমি সিধে দোলনা থেকে উঠে প্রফেসর হয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে চক হাতে দাঁড়িয়ে গিয়েছি।

এই প্রতিকূলতার মুখে ছাত্রদের উদ্দীপনাই আমাকে জোর দিয়েছিল। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। আমি অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী পেয়েছিলাম। যেমন, সৌরীন ভট্টাচার্য, যে পরে বিদ্যাবেত্তা ও লেখক হিসেবে নিজের বিশিষ্টতার পরিচয় রেখেছে। নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার সাহস যাঁদের হয়েছিল তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন প্রতিভাবান। যাদবপুর ছাড়ার পরেও বহু দিন পর্যন্ত এদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। তারা নিজেদের মধ্যেও যোগাযোগ রেখে চলত (সৌরীনের স্ত্রী রেবাকেও আমার প্রথম ব্যাচে পেয়েছিলাম, এবং সে-ও দারুণ ছাত্রী ছিল)।

৫

বহু দিন ধরে বিশিষ্ট এক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হিসেবে চলে আসার কারণে বুদ্ধিচর্চার দিক দিয়ে যাদবপুর ছিল চমৎকার এক জায়গা। এখানকার সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ দুটোই আমি সানন্দে গ্রহণ করি। সব বিভাগে ছিলেন এক জন করে প্রফেসর তথা বিভাগীয় প্রধান। আমাকে বাদ দিয়ে বাকি সব বিভাগের নবনিযুক্ত প্রধানরা সবাই ছিলেন বেশ প্রতিষ্ঠিত এবং বিশিষ্ট। বয়সেও তাঁরা আমার চেয়ে বেশ বড় ছিলেন। ইতিহাস বিভাগের প্রধান ছিলেন সুশোভন সরকার। আমি যখন প্রেসিডেন্সিতে অর্থনীতি পড়ছিলাম তিনি তখন সেখানকার ইতিহাস বিভাগে পড়াতেন। সুশোভনবাবু ছিলেন অসামান্য শিক্ষক ও বড় রকমের চিন্তাবিদ। তাঁর প্রভাবটা আমার ওপর খুব বেশি করেই পড়েছিল— প্রেসিডেন্সিতে ডিপার্টমেন্টের বেড়া ভেঙে আমি নিয়মিত তাঁর ক্লাসে যেতাম। সুশোভনবাবুর সহকর্মী হতে পারাটা আমার কাছে ছিল বিরাট একটা সুযোগ। যাদবপুরে আমার বয়সি কাউকে অধ্যাপক হিসেবে মেনে নেওয়া কঠিন ছিল! এমন একটা অবস্থায়, আমার প্রতি তাঁর স্নেহের কারণে, আমি প্রায়শই তাঁর কাছ থেকে এক জন অল্পবয়সি অধ্যাপক হিসেবে আমার কী করা— এবং কী না করা— উচিত, সে বিষয়ে নিয়মিত অত্যন্ত কার্যকর পরামর্শ পেতাম।

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রধান ছিলেন সকলের সুপরিচিত লেখক বুদ্ধদেব বসু, কবিতা এবং উদ্ভাবনী গদ্য লিখনের সুবাদে যিনি খুবই খ্যাতিমান। আমি তাঁর কাজের বিশেষ অনুরাগী ছিলাম। তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবেও চিনতাম, কেননা, তাঁর কন্যা মীনাক্ষী— মিমি— ও তার স্বামী জ্যোতি প্রেসিডেন্সিতে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।

বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন সুশীল দে। তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত হিসেবে অতীব সম্মানিত। সুশীলবাবু ও বুদ্ধদেব বসু দু'জনেই আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন, তাঁরা আমার বাবার সহকর্মী ছিলেন। বিপদের কথা হল, সুশীল দে আমার ঠাকুরদাকেও ভাল ভাবে চিনতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নীতি বিষয়ে প্রায়শই তাঁর সঙ্গে আমার মতের অমিল হত— সুশীলবাবু খুব রক্ষণশীল ছিলেন— এবং তখন তিনি মাঝে মাঝেই আমাদের বয়সের পার্থক্য বিষয়ে দু'একটা কথা বলতেন এবং আমাকে মনে করিয়ে দিতেন যে, তিনি আমার থেকে অন্তত চল্লিশ বছরের বড়। সেই প্রসঙ্গেই তিনি তাঁর যুক্তিগুলোর সঙ্গে আমার বংশলতিকাটি জুড়ে দিতেন (তখন অসহায় বোধ করা ছাড়া আমার কিছুই করার থাকত না)। এক বার তিনি বললেন, "তোমার ঠাকুর্দা খুবই বিজ্ঞ লোক ছিলেন; তুমি যে বিষয়টা বুঝতে পারছ না, তিনি কিন্তু সেটা খুব সহজেই ধরে ফেলতেন।" এখানে জানিয়ে রাখি, অধ্যাপক দে-র সঙ্গে আমার যখনই কোনও তর্ক হত, তার সব ক'টাতে তিনিই জিততেন।

৬

আমাদের সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন আশ্চর্য রকমের উদ্ভাবনী চিন্তাসম্পন্ন ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহ, যিনি পরে ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক ইতিহাস চর্চায় সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ় (নিম্নবর্গের ইতিহাস) নামক অত্যন্ত প্রভাবশালী ধারাটির প্রবর্তন করেন (মার্ক্সীয় চিন্তার দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত এই ধারা পরে ভিন্নতর একটা পথ নেয়)। আমি ওঁকে রণজিৎদা বলে ডাকতাম— বয়সে খুবই তরুণ হলেও তিনি আমার থেকে কয়েক বছরের বড় ছিলেন। যাদবপুরে ক্লাস শুরু হওয়ার পর-পরই এক দিন

ক্যাম্পাসে রণজিৎদার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমার বেজায় আনন্দ হল— আমি ওঁর সম্পর্কে এবং ওঁর চিন্তার অসাধারণ মৌলিকতা বিষয়ে আগে থেকেই অবহিত ছিলাম।

প্রথম দর্শনেই রণজিৎদা বললেন, "ইউনিভার্সিটি নাকি আপনাকে প্রফেসর হিসেবে নিয়ে মস্ত ভুল করেছে, চতুর্দিকে আপনার প্রচণ্ড নিন্দে শুনছি, আপনি তো খুবই প্রসিদ্ধ লোক।" তার পর বললেন, "চলুন কোথাও একসঙ্গে বসা যাক,'' বলেই আমাকে রাত্রে খাওয়ার নেমন্তন্ন করে বসলেন। সেই সন্ধেতেই ওঁর সঙ্গে ওঁর পণ্ডিতিয়া রোডের ফ্ল্যাটে গেলাম, আর তার পর থেকে ওটা হয়ে উঠল আমার এক নিয়মিত আড্ডার জায়গা। আগে রণজিৎদা কমিউনিস্ট পার্টিতে খুব সক্রিয় ছিলেন, কিন্তু আমার সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হয় তত দিনে তিনি নির্ধারণ করেছিলেন যে, কমিউনিস্ট পার্টিতে থাকাটা ভুল হবে। তবে তিনি বিপ্লবীই থেকে গিয়েছিলেন— কিছুটা নীরবে এবং সম্পূর্ণ

অহিংস ভাবে— এবং কাজ করে চলেছিলেন সমাজের পিছনে পড়ে থাকা অবহেলিত মানুষের জন্য। কিন্তু, স্তালিনবাদে কলকাতার প্রচণ্ড উৎসাহ সত্ত্বেও, তার ওপরে এবং কমিউনিস্ট সংগঠনের ওপরে তিনি একেবারে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। রণজিৎদার স্ত্রী ছিলেন মার্তা। তিনি পোলান্ডের লোক। তাঁরা প্রায়ই বন্ধুদের নেমন্তন্ন করতেন, সেখানে আমারও ডাক পড়ত। কত সন্ধ্যায় যে

তাঁদের বাড়িতে নানা সুখাদ্য সহযোগে চায়ের আসর বসেছে তার ইয়ত্তা নেই। আর তার সঙ্গে চলত নির্ভেজাল আড্ডা— আগে থেকে ঠিক না করা নানা বিষয়ে আলোচনা।

সে-সময় রণজিৎদা তাঁর প্রথম বই 'আ রুল অব প্রপার্টি ফর বেঙ্গল' লেখার কাজ করছিলেন। এই বই-ই তাঁকে এক বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ এবং অসামান্য কল্পনাশক্তি ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টি সম্পন্ন মেধাজীবীর স্বীকৃতি এনে দেয়। লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালে বাংলার ওপর যে মারাত্মক 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' চাপিয়ে দেন, তার পিছনে কী ধরনের

চিন্তাভাবনার প্রভাব পড়েছিল, রণজিৎদা এ-বইতে সেই দিকটা নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেশের ভয়ানক ক্ষতিসাধন করে। (অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিতে দেখলে এই ক্ষতিটা হয় কৃষির উন্নতির জন্য যে সব ইনসেন্টিভ বা প্রোৎসাহন দরকার তার সবগুলোকেই লুপ্ত করে দেওয়ার, এবং জমির মালিকানা-ভিত্তিক অসাম্যকে চিরস্থায়ী করে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে।)

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি নিয়ে অন্যান্য গবেষণাগুলো থেকে রুল অব প্রপার্টি একেবারে আলাদা, এবং অসাধারণ মৌলিক একটি কাজ। সেই সময় সাম্রাজ্যবাদের আলোচনায় লোভ ও স্বার্থের ভূমিকার ওপর জোর পড়ত, সেটাই ছিল তখনকার প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি। রণজিৎদা সেখানে এর পিছনে আইডিয়া-র (ধারণা) ভূমিকাটাকে সামনে তুলে আনলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে প্রদর্শিত কারণ এবং এর পিছনের যৌক্তিক ধারণাগুলোর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার ছিল, কেননা— সুপ্রচেষ্টা সত্ত্বেও— এই বন্দোবস্তের ফল হয়েছিল ভয়ঙ্কর। রণজিৎদা যে ব্যাপারটাতে আলোকপাত করেন সেটাতে খুবই অভিনবত্ব ছিল। তিনি সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং ভারতীয় প্রজাদের উপর ব্রিটিশ স্বার্থের আধিপত্যের দিক থেকে সরে গিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন বাংলায় ভূমি বন্দোবস্তের পিছনে সক্রিয় বিভিন্ন চিন্তার উপর, যে চিন্তাগুলির উদ্দেশ্য ভালই ছিল, কিন্তু তাদের এলোপাতাড়ি প্রয়োগ শেষ পর্যন্ত কর্নওয়ালিসের প্রলয়ঙ্কর ব্যবস্থাকে ডেকে আনে।

তবে রণজিৎদা যে কাজের জন্য এখন সবচেয়ে বিখ্যাত, সেটা রুল অব প্রপার্টি নয়। সেটা হল তাঁর শুরু করা এবং তাঁরই নেতৃত্বে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ় বা নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা। এর প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। (এই সঙ্কলনের একটি প্রবন্ধ ছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা।) নিম্নবর্গের ইতিহাস ছিল তাঁর প্রথম বইয়ের চেয়ে অনেক বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ইতিহাসের উচ্চবর্গীয় ব্যাখ্যার সামগ্রিক বিরোধিতা আছে এর অন্তর্গত প্রবন্ধগুলোতে। রণজিৎদার ইতিহাসদর্শনে নিহিত প্রধান সমালোচনাটা হল এই যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসবীক্ষায় দীর্ঘকাল ধরেই উচ্চবর্গীয় আধিপত্য বজায় আছে। এর

মধ্যে ঔপনিবেশিক এবং জাতীয়তাবাদী উভয় ধরনের উচ্চবর্গীয়তারই দেখা মেলে। আর রণজিৎদার কাজ হল এই আধিপত্যগুলোকে ভাঙা। উচ্চবর্গীয়দের কীর্তির ওপর কেন্দ্রীভূত ইতিহাসচর্চার ধারা থেকে সরে এসে নতুন করে ভারতীয় ইতিহাস রচনার— কার্যত সাধারণ ভাবেই ইতিহাস রচনার— এই কাজটি ছিল বাস্তবিকই খুব বড়।

৫ জুলাই ২০১৯, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা (ক্যালকাটা আফটার ইন্ডিপেনডেন্স: আ পার্সোনাল মেমোয়ার)